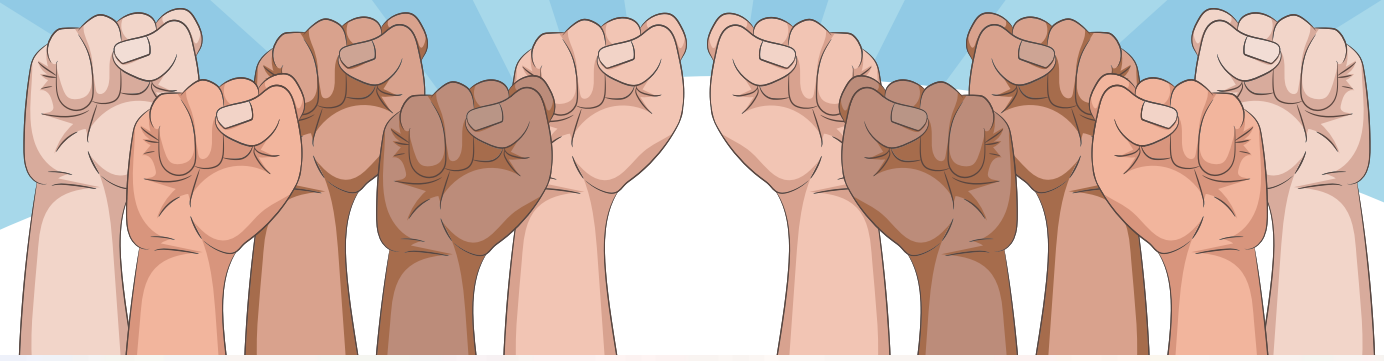

গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র

অরুণ কর্মকার

শুরুতে প্রচলিত একটি কৌতুক বলি। এক ছাত্রাবাসে ১০০ জন আবাসিক ছাত্র। সেখানে প্রতিদিন বিকেলের নাশতায় সিঙাড়া দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা চলতে থাকায় আবাসিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তারা নাশতা পরিবর্তনের দাবি তোলেন। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, এ ব্যাপারে আবাসিকদের প্রত্যেকের মতামত নেওয়া হবে। সে অনুযায়ী ছাত্রদের বলা হয়, নাশতায় তারা কী খেতে চান তা যেন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে লিখিতভাবে জানান। শিক্ষার্থীরা তাই করলেন। তাতে দেখা গেল, ১৯ জন বলেছেন ডিম-পরাটা; ১৭ জন রুটি-সবজি, ১৬ জন হালুয়া-রুটি, ১৪ জন ছোলা-মুড়ি-পিঁয়াজু, ১৩ জন এগনুডলস এবং ২১ জন বলেছেন সিঙাড়ার কথা। সুতরাং অধিকাংশের পছন্দ ও মত অনুযায়ী সিঙাড়াই বহাল।

গণতন্ত্রের রঙ এবং রঙের কোনো শেষ নেই। উদার, সীমিত, সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি শাসিত, কেন্দ্রিকতার গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এগুলো গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরন। তবে এর কোনোটিই ব্যঙ্গ করার বিষয় নয়। বিষয় উপলব্ধির, অনুধাবনের। সেই খ্রিষ্টপূর্বকাল থেকে গ্রিক দার্শনিক মনীষি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল এবং পরবর্তীকালের পূজনীয় সব দার্শনিক ও রাজনীতিবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্র নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। তারা সকলেই গণতন্ত্রের মূল উপাদান হিসেবে দেখেছেন একটি শিক্ষিত-সচেতন জনগোষ্ঠীকে। অন্য কথায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসচেতন ও উদ্ভট মানসিকতায় সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। জনগণের পর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে শাসক নির্বাচন।

এই শাসক নির্বাচন প্রসঙ্গে একজন শিষ্যের সঙ্গে আলোচনায় সক্রেটিস একটি উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি এরকম - একটি দেশের নির্বাচনে দু'জন প্রার্থী। একজন ডাক্তার, অপরজন মিষ্টি বিক্রেতা। মিষ্টি বিক্রেতা প্রার্থী তার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে জনগণকে বলেন, ডাক্তার আপনাদেরকে নানা রকম তিক্ত-কষা ওষুধ খাওয়ান; পছন্দের খাবার খেতে নিষেধ করেন। আর তিনি জনগণের জন্য বিচিত্র ধরনের মিষ্টি খাবার তৈরি করেন। পছন্দের খাবার খেতে উৎসাহ দেন। অপরদিকে ডাক্তার প্রার্থী ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি যা বলেন এবং করেন তা জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং ভালো থাকার জন্য করেন। এখন ওই দেশটির জনগণ, অন্ততপক্ষে অধিকাংশ জনগণ যদি শিক্ষিত-সচেতন না হয় তাহলে ভোটে কে জিতবেন? নিশ্চয়ই মিষ্টিওয়ালা।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও ঘটনাটি জনান্তিকে শোনা এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত। খ্যাতিমান আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন একবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার মিরপুরের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রচার করতেন, 'ডাক্তার কামাল হোসেনকে আপনারা কেন ভোট দেবেন? সে এতবড় একজন ডাক্তার হয়েও কোনোদিন কি ভিজিট ছাড়া কাউকে চিকিৎসা করেছেন বলে শুনেছেন?' বলা বাহুল্য, সেই নির্বাচনে ড. কামাল হোসেন পরাজিত হয়েছিলেন।

সে যাই হোক, আবার দার্শনিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কথায় আসি। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো তো প্রচলিত ধারার নির্বাচনী গণতন্ত্রকে বলেছেন 'নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা'। কেননা এই ব্যবস্থায় খারাপ এবং অযোগ্য লোকেরা ভালো এবং যোগ্য লোকদের শাসন করার সুযোগ পায়। তাই তিনি যোগ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'রাজনীতি করো। না হলে কোনো অযোগ্য লোক তোমাকে শাসন করবে।' আর প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল 'ব্যর্থতাই গণতন্ত্রের নিয়তি' বলে গণতন্ত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, প্রচলিত ধারার গণতন্ত্রে যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা শাসনক্ষমতার অধিকারী হয় তাদের পক্ষে নীতিবোধ বজায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কারণ এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা সমাজের যে স্তরের মানুষ তারা সব সময় নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। রাষ্ট্রের কল্যান তাদের কাছে মুখ্য নয়।

আজকের পৃথিবীতে উন্নত-অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক শাসন

ব্যবস্থার যে চালচিত্র আমরা দেখতে পাই তার মধ্যেই গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রাচীনকালের দার্শনিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নেতিবাচক মনোভাবের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমরা ধীরে ধীরে আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পারি।

আজকাল আমরা যে গ্লোবোল ভিলেজ বা সমগ্র বিশ্ব একটি গ্রাম বলে মানি, সেই ধারণার প্রবর্তক হচ্ছেন হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান নামের একজন দার্শনিক। ১৯৬৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় তার দিন শেষ। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যানে মানুষ বহুবিধ গোষ্ঠীতে (ট্রাইব) রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক বিভাজন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাজনৈতিক বিরোধের ধরন একেবারে পাল্টে গেছে। দলের প্রতি অতিমাত্রায় আনুগত্য দেখা দিয়েছে। গোষ্ঠীগত আনুগত্য, নেতৃত্ব পূজা, নিজেদের ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখা, প্রতিপক্ষের ভুলকে বড় করে তোলা এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস না করার প্রবণতা বেড়ে গেছে।' তথ্যপ্রযুক্তির সীমাহীন উৎকর্ষের এই যুগে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতা (ট্রাইবালাইজেশন) এবং গণতন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতাগুলো যে আরো বেড়েছে তা তো আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি।

তা সত্ত্বেও পৃথিবীব্যাপী আমরা 'গণতন্ত্র চর্চার' ব্যাপক বিস্তার দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেক দেশের শাসকগোষ্ঠীই কোনো না কোনোভাবে একটা নির্বাচন করে গণতন্ত্রায়নের অগ্রযাত্রায় সামিল হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সে সব নির্বাচনে জনগণের কী ভূমিকা তা রীতিমত গবেষণা করে বের করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুরবস্থা থেকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি, হান্টিংটন 'টু টার্নওভার টেস্ট' (দুইবার ক্ষমতা বদলের পরীক্ষা) নামে একটি তত্ত্ব হাজির করেছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে কোনো দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ নিয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে ওই দেশটিতে পরপর দুটি সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং ওই নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে কিনা; পরাজিতরা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েছে কিনা; বিজয়ীরা ক্ষমতায় বসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবর্তন এনে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে কিনা।

উনিশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল আবার সংখ্যাগুরুর মতামতকেই গণতন্ত্র বলে মানতে নারাজ। তিনি বলেছেন, যেখানে কেবল সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও মতামতকে সমগ্র জাতীয় স্বার্থ বলে গণ্য করা হয় সেখানে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র থাকতে পারে না। সে গণতন্ত্র ভ্রান্ত গণতন্ত্র। তার মত হচ্ছে- সর্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করার আগে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটানো অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ যারা যথেষ্ঠ শিক্ষিত না তাদের ভোটাধিকার থাকার বিষয়ে তার আপত্তি ছিল। যারা কর দেন না তাদের ভোটাধিকার থাকা উচিৎ নয় বলেও মনে করতেন তিনি। অন্যদিকে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের একাধিক ভোটের অধিকার নীতির সমর্থক তিনি। আবার এই কারণে যেন শ্রেণি স্বার্থের উদ্ভব না ঘটে সে জন্য তিনি বলেছেন, 'যোগ্যতা থাকলে যেন দারিদ্রতম ব্যক্তিটিও একাধিক ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।'

গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের যুগে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সেই বিখ্যাত উক্তি 'ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল।' জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই হচ্ছে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। কিন্তু বাস্তবেও কি আমরা তা-ই দেখতে পাই! যুক্তরাষ্ট্রেও? খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও যখন ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে জনগণ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে, ইসরাইলকে সহায়তা না করার দাবি তোলে তখনও কি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতির কোনো পরিবর্তন হয়? কখনো হয়েছে? সে দেশের দ্বি-দলীয় গণতন্ত্রেরই বা অবস্থা কী? নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ক্যাপিটল হিলে হামলা করে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে কি দুটি দলের নীতিগত বিরোধজনিত গণতান্ত্রিক আচরণ বলে মেনে নেওয়া যায়? এটা তো যে কোনো উপায়ে এক দল আরেক দলকে উপড়ে ফেলতে চাওয়ার লক্ষণ। এর মধ্যে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্যই বা কোথায়, আর জনগণের শাসনই বা কোথায়? জনগণ তো এখানে সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত! মোটকথা যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক দেশেও ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচনের পর জনগণের বক্তব্য কিংবা মতামত আর বেশি শোনার বা শোনানোন অবকাশ থাকে না। অবশ্য এটাও গণতন্ত্রেরই বিধি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তো জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করবেন!

গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি মোক্ষম কথা বলেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, 'মানুষ কথা বলতে ভয় পেলে বুঝতে হবে গণতন্ত্র নেই।' অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ে মানুষ যেন নির্ভয়ে কথা বলতে পারে। কথা বললে যেন রাষ্ট্রশক্তির কিংবা কোনো সামাজিক শক্তির বিরাগভাজন হতে কিংবা রোষানলে পড়তে না হয়। কিন্তু তেমন গণতান্ত্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি খুব কম দেশেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা প্রত্যেকে ভেবে দেখতে পারি, আমাদের দেশে কোন কালে আমরা নির্ভয়ে কথা বলতে পেরেছি। গত আমলে, তার আগের আমলে কিংবা তারও আগের আগের আগের কোনো আমলেই নির্ভয়ে কথা বলা যেত কিনা। এখনো যায় কিনা। যদি না যায় তাহলে আমাদের কীসের গণতন্ত্র!

এগুলো সবই হলো গণতন্ত্রের নানা তত্ত্ব এবং রঙের কথা। আসল কথা হলো, তবুও আমরা গণতন্ত্র চাই। ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ৩০টি দেশজুড়ে একটি জরিপ চালিয়েছিল। দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, চীন, রাশিয়া যেমন ছিল তেমনি ছিল বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নাইজেরিয়া, কেনিয়ার মতো দেশও। 'ওপেন সোসাইটি ব্যারোমিটার: ক্যান ডেমোক্রেসি ডেলিভার' শীর্ষক ওই জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ৮৬ শতাংশ মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করতে চায়। ৬২ শতাংশ মানুষ অন্য যে কোনো শাসনব্যবস্থার চেয়ে গণতন্ত্রকেই ভালো মনে করেন।

আমি বলবো, মানবাধিকারের অনুপস্থিতি গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে দেয়। শতভাগ মানুষের পূর্ণ মানবাধিকার ছাড়া যে গণতন্ত্র তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্যসূত্র: গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা।